ওয়ায়েল হাল্লাক রচিত ‘দ্য ইম্পসিবল স্টেট’

শাইখ আবু কাতাদা আল-ফিলিস্তিনি হাফিজাহুল্লাহর ‘মৃত্যুর পূর্বে হাজার গ্রন্থ’ নামক বই থেকে, যেখানে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থের পর্যালোচনা করেছেন।

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য চাই এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট আমাদের নফসের অনিষ্ট এবং আমাদের মন্দ আমল থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল, তাঁর নির্বাচিত বান্দা ও প্রিয় বন্ধু। তিনি রিসালাতের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন, আমানত আদায় করেছেন, উম্মাহকে নসীহত করেছেন এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন তেমন জিহাদ, যেমনটি করা হক ছিল, যতক্ষণ না তাঁর নিকট ইয়াকীন (মৃত্যু) এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে এমন এক সুস্পষ্ট পথের উপর রেখে গেছেন, যার রাত তার দিনের মতোই আলোকিত। ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ এ পথ থেকে বিচ্যুত হয় না।

আজকের এই নতুন বৈঠকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ‘মৃত্যুর পূর্বে হাজার গ্রন্থ’ (A Thousand Books Before Death) প্রকল্পের অংশ হিসেবে আজ আমরা একটি নতুন বই নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ড. প্রফেসর ওয়ায়েল হাল্লাকের লেখা ‘The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament’.

এই বইটি আলোচনার শুরুতে আমরা পড়ার শিল্পের একটি বিশেষ নীতির উপর জোর দিতে চাই। আমার লেখা ‘পড়ার শিল্প’ (The Art of Reading) বইটিতে আমি একটি কথা উল্লেখ করেছি: *কখনো কোনো বই পড়ার আগে সেই বইয়ের সমালোচনা পড়বেন না।* বরং আপনার উচিত, প্রথমে নিজে বইটি পড়া, নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটির মূল্যায়ন করা এবং অন্যের মতামতের প্রভাব ছাড়াই বইটিকে বোঝা। পড়া শেষ হলে, আপনি সমালোচকদের পর্যালোচনার দিকে যেতে পারেন। তখন মিলিয়ে দেখতে পারবেন, সমালোচকদের কাতারে আপনার অবস্থান কোথায়। আপনার বিশ্লেষণ কি সঠিক ছিল, নাকি ভুল? আপনি কি মূল বিষয়টি ধরতে পেরেছেন, নাকি ব্যর্থ হয়েছেন?

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি। সত্যি বলতে, এই বইটিকে ঘিরে খুব ব্যাপক সমালোচনা বা আলোচনা না হলেও, আমি বইটি পড়ার আগেই এর সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা শুনে

প্রভাবিত হয়েছিলাম। আমি সেই ফাঁদে পা দিয়েছিলাম। ফলে, আমি একদম খোলামেলাভাবেই স্বীকার করছি যে, একটি পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব নিয়েই আমি বইটি পড়া শুরু করি। বইটির সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, 'The Impossible State' বা 'অসম্ভব রাষ্ট্র', খুবই উসকানিমূলক। এর শাব্দিক অর্থ ধরলে, এটি নিঃসন্দেহে একটি উসকানিমূলক শিরোনাম।

আমি তখনো বইটি হাতে পাইনি, এমনকি এর পুরো শিরোনামটিও জানতাম না। বইটির পূর্ণাঙ্গ শিরোনাম হলো: 'Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament' (ইসলাম, রাজনীতি এবং আধুনিকতার নৈতিক সংকট)। এই পূর্ণাঙ্গ শিরোনামটিই বইটির মূল বক্তব্যকে সঠিকভাবে তুলে ধরে। সত্যি বলতে, লেখক এখানে ইসলামি রাষ্ট্রের অসম্ভবতাকে সরাসরি ইসলামের দিকে ইঙ্গিত করেননি। বরং তিনি যদি অসম্ভবতার কথা বলেও থাকেন, তবে তা দুটি কারণে। প্রথম কারণটি মুসলিমদের নিজেদের সাথে সম্পর্কিত, যদিও তিনি তা সরাসরি বলেননি, তবে ইশারায় বুঝিয়েছেন। আর দ্বিতীয় কারণটি হলো 'আধুনিকতার নৈতিক সংকট'। লেখকের মতে, আধুনিকতার কাঠামো এবং নৈতিকতা বিষয়ে এর দৃষ্টিভঙ্গিই হলো মূল সমস্যা। সুতরাং, তাঁর দৃষ্টিতে ইসলামি রাষ্ট্র 'অসম্ভব'—এই কথাটির অর্থ এমন নয় যে এটি কখনোই প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, বরং এর অর্থ হলো কাজটি অত্যন্ত কঠিন ও শ্রমসাধ্য। বইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে লেখক নিজেও স্বীকার করেছেন যে এটি অসম্ভব নয়। দেখে মনে হয়, তিনি এই শিরোনামের মাধ্যমে একদিকে পাঠককে যেমন উসকে দিতে চেয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে তাঁর বিরোধীদের আশ্বস্তও করতে চেয়েছেন।

আশ্চর্যজনকভাবে, আমি লক্ষ্য করলাম যে এই বইটি মূলত মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে লেখা হয়নি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় যখন তিনি তাঁর আলোচনার গভীরে যান এবং দেখতে পান যে তাঁর প্রধান বিরোধীপক্ষ হবে আধুনিকতার প্রবক্তারা। তখন তিনি তাঁর অবস্থানকে অতীতমুখী, প্রতিক্রিয়াশীল বা জীবনবিমুখ হিসেবে দেখানোর অভিযোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সাফাই গাইতে শুরু করেন।

এ কারণেই, যে ব্যক্তি এই বইটিকে সেভাবে দেখবে, যেভাবে আমি একসময় ভেবেছিলাম, সে ভুল করবে। সত্যি বলতে, শিরোনামের প্রথম অংশটির কারণে আমি কিছু অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তুও ভুল বোঝা শুরু করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, লেখক রাষ্ট্রের 'কাদরি' বা তাকদির-সম্পর্কিত দিক নিয়ে আলোচনা করছেন। আপনারা জানেন, ধর্মীয় বৈধতার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে যুক্তিগুলো দেওয়া হতো, সেগুলো ব্যর্থ হয়েছে। তথাকথিত 'রাজনৈতিক ইসলাম'-এর বিরুদ্ধে একসময় যে বিদ্বেষ আর বিরোধী বয়ান ছিল—যেমন ইসলাম রাষ্ট্র তৈরি অসম্ভব, ইসলামে কোনো রাষ্ট্র নেই, বা ইসলাম কোনো রাষ্ট্র তৈরি করে না—সেই সমস্ত যুক্তি এখন ধ্বসে পড়েছে। আজ আর কেউ এসব কথা বলে না।

অবশ্য, এই বিষয়টিকে পাশ কাটানোর কিছু প্রচেষ্টা এখনও দেখা যায়। যেমন বলা হয়, ইসলামকে জাতি-রাষ্ট্র, আধুনিকতা বা সিভিল স্টেটের অধীন করা যেতে পারে। কিন্তু আজ কেউ প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে—এবং সেই ঘোষণার জন্য সম্মান পেয়ে—বলতে পারবে না যে বিধান ও টেক্সটের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি রাষ্ট্র একটি কল্পকাহিনী।

তাই আমি ভেবেছিলাম যে, লেখক হয়তো 'কাদরি' বা তাকদিরের দিকটির আশ্রয় নিয়েছেন, অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন যে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তাকদিরের দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভব। বইটি সম্পর্কে এটাই ছিল আমার প্রাথমিক ধারণা। আমার মনে হয়েছিল, তিনি যুক্তি দিচ্ছেন যে ইসলামি রাষ্ট্রের একটি সুউচ্চ নৈতিক দিগন্ত রয়েছে, কিন্তু বাস্তবতা হলো এক কলুষিত অবস্থা। 'কলুষিত' শব্দটি আমার, কিন্তু এই ধারণাটি পুরো বই জুড়ে পাওয়া যায়। কারণ আধুনিকতা হলো এক সম্পূর্ণরূপে কলুষিত ব্যবস্থা, যা নৈতিকতা-বিবর্জিত, মূল্যবোধ-শূন্য এবং কেবল পুঁজি ও অর্থনীতি দ্বারা শাসিত।

এর ফলে যে কেউ ভাবতে পারে যে, লেখক বলতে চেয়েছেন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, কারণ তাকদির (কদর) এর চেয়ে শক্তিশালী। এই ধারণাটি আমাকে তৎক্ষণাৎ এই সন্দেহে ফেলেছিল যে, তিনি হয়তো ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার 'ইতিহাসের সমাপ্তি' (End of History) তত্ত্বে বিশ্বাসী।

এই বিষয়টি আমি আবারও বলছি কারণ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রমবিকাশ বোঝা জরুরি, যা ছাড়া হাল্লাক রাষ্ট্রকে কীভাবে চিত্রিত করেছেন এবং মুসলিমরা এটি প্রতিষ্ঠায় কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়, তা বোঝা যাবে না। আমি আবারও বলছি, আজকের আলোচনা হয়তো দীর্ঘ হবে, কারণ **আমি বইয়ের প্রতিটি অনুচ্ছেদকে 'গুরুত্বপূর্ণ' হিসেবে চিহ্নিত করতে বাধ্য হয়েছি। আমি এতে কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা খুঁজে পাইনি। পাঠক যদি এই বইয়ের কোনো একটি অনুচ্ছেদ এড়িয়ে যায়, তবে সে অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে এবং বইটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাবে না। আমি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথেই একথা বলছি।**

মূল কথায় ফিরে আসি। যখন ইসলামি রাষ্ট্রের বিধানিক ভিত্তি অস্বীকার করার ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো, তখন আমি ভাবলাম যে হয়তো এই বইটি 'কাদরি' বা তাকদিরের দিক থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে অসম্ভব প্রমাণ করতে এসেছে। কেন? কারণ 'The Impossible State' শিরোনামটি ইঙ্গিত দেয় যে এটি হয়তো কোনো ঐশী বিধানের কারণেই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। এর কারণ কী? কারণ ইসলাম, তার উচ্চ নৈতিক দিগন্ত এবং তার রাষ্ট্রের কাঠামো—যা লেখকের মতে দুটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত: শরিয়াহ এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া—বর্তমান বাস্তবতার সাথে বেমানান। লেখক রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখেন এবং তিনি আধুনিকতার ধারণার একজন কঠোর সমালোচক।

তাই আমি ভেবেছিলাম তিনি বলছেন, যেহেতু আধুনিকতা তার তিনটি রূপে—যা তিনি পরে উল্লেখ করবেন এবং যার সবই অর্থনীতিতে কেন্দ্রীভূত—প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে, তাই ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এখানে আধুনিকতা মানে তার সবচেয়ে অগ্রগামী রূপ, অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা।

সুতরাং, আধুনিকতা জয়লাভ করেছে তার মূল্যবোধহীনতা, অর্থনৈতিক নির্ভরতা এবং নৈতিকতার অনুপস্থিতি নিয়ে। তার বিপরীতে রয়েছে এমন একটি ইসলামি রাষ্ট্র, যা তার সকল মাত্রায় নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব, এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এই চিন্তাটিই আমাকে লেখক 'ইতিহাসের সমাপ্তি' তত্ত্বে বিশ্বাসী বলে সন্দেহে ফেলে দিয়েছিল। কারণ তখন যুক্তিটি দাঁড়ায়: "আমরা আধুনিকতাকে ধ্বংস করতে পারি না। আধুনিকতা আমাদের অনিবার্য নিয়তি, যা পশ্চিমা আমেরিকান ও ইউরোপীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানবতা তার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছেছে। এটি এমন এক বাস্তবতা, যা থেকে পালানোর কোনো পথ নেই। মুসলিম দা'ঈরা যদি এই আধুনিকতার সাথে লড়াই করতে আসে, তবে তারা একে পরাস্ত করতে পারবে না।" এর অর্থ দাঁড়ায়, তিনি ইতিহাসের সমাপ্তিতে বিশ্বাসী।

বইয়ের শুরুতে তিনি একটি সতর্কবাণী দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম সেটি কেবল চোখে ধুলো দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা।

কিন্তু তিনি আসলে এমন কথা বলছেন না। তিনি বলছেন না যে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। তাঁর মতে, বাধাগুলো ইসলামের অভ্যন্তরীণ নয়; অর্থাৎ ইসলামের মূল্যবোধগুলো একটি নৈতিক রাষ্ট্র বাস্তবায়নে অক্ষম, বিষয়টি এমন নয়। বরং মূল বাধাটি নিহিত রয়েছে আধুনিকতার পরবর্তী পর্যায় নির্মাণ করার ক্ষেত্রে মুসলিমদের সক্ষমতার মধ্যে। এর মানে কী?

এর মানে হলো, তিনি বলছেন যে, মুসলিমরা যদি সত্যিকারের একটি ইসলামি রাষ্ট্র চায়—যেমনটি শরিয়াহ তার সর্বোচ্চ মূল্যবোধের মাধ্যমে তৈরি করেছে এবং যেমনটি ইসলামের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা তার মহান, নীতিভিত্তিক রাষ্ট্রের মাধ্যমে দেখিয়েছে—তবে তাদেরকে সেই একই শক্তির স্তরে পৌঁছাতে হবে, যে স্তরে ইউরোপীয় ও আমেরিকানরা ছিল যখন তারা পুরনো, ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আধুনিক রাষ্ট্র তৈরি করেছিল। এটি অত্যন্ত চমৎকার একটি কথা এবং এ বাস্তবতা তিনি স্বীকার করেন। তিনি বলেন, যদি মুসলিমরা একটি রাষ্ট্র তৈরি করতে চায়, তবে তাদের অবশ্যই এমন এক প্রচণ্ড ও বিশাল শক্তির অধিকারী হতে হবে, যা আধুনিকতাকে ভাসিয়ে নিয়ে একটি উত্তর-আধুনিক পর্যায় তৈরি করতে সক্ষম হবে। তিনি ঐতিহাসিকভাবে এই শক্তিকে ইউরোপ ও আমেরিকার সেই শক্তির সাথে তুলনা করেছেন, যা তারা গির্জাভিত্তিক (ecclesiastical) ও সামন্ততান্ত্রিক (feudal) ব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলে আধুনিক রাষ্ট্র তৈরি করতে ব্যবহার করেছিল। অন্য কথায়, তিনি ইসলামকে উত্তর-আধুনিক (post-modern) যুগে প্রবেশের একটি মহান পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন।

অতএব, সম্পূর্ণ পাঠের প্রেক্ষাপট ছাড়া এই বই বা এর শিরোনাম সম্পর্কে যেকোনো ধারণা ত্রুটিপূর্ণ হবে। এই বইটি একটি নিখুঁত গাণিতিক যুক্তির উপর নির্মিত, যেখানে কোনো ফাঁক নেই। লেখক একজন বুদ্ধিমান, গভীর পাঠক, যিনি বিষয়গুলোকে তাদের সঠিক প্রেক্ষাপটে রেখে আলাপ করেন। তিনি নিজের প্রতি এবং যে পরিবেশে তিনি বাস করেন, তার প্রতি সৎ, এবং সেই পরিবেশকেই তিনি শক্তিশালীভাবে চ্যালেঞ্জ করছেন।

যে ভিত্তিগুলোর উপর বইটি নির্মিত

বইটি নিম্নলিখিত ভিত্তিগুলোর উপর নির্মিত:

প্রথমত: ইসলামি রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর ধারণাটি একেবারেই সঠিক। এই ক্ষেত্রে তিনি তথাকথিত 'আধুনিকতাবাদী ইসলাম' নিয়ে যারা লেখেন, তাদের ছাড়িয়ে গেছেন।

প্রশ্ন হলো, এমন মুসলিম কি আছেন যারা একটি আধুনিকতাবাদী ইসলাম চেয়েছেন? উত্তর হলো, হ্যাঁ। যখন আমরা প্রফেসর রাশিদ আল-ঘানুশির 'Public Liberties in the Islamic State' (ইসলামি রাষ্ট্রে নাগরিক স্বাধীনতা) বইটি পড়ি, তখন দেখি তিনি একটি আধুনিকতাবাদী ইসলাম চান। ফলে, মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রফেসর ঘানুশির বুদ্ধিবৃত্তিক ধারাটি আধুনিকতাবাদী হলেও, তা আধুনিকতার ঊর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা নয়, বরং ইসলামকে আধুনিকতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এর বিকৃতি ও বিনাশ সাধন।

দেখুন, এই ব্যক্তি—একজন খ্রিস্টান এবং একজন বিশেষজ্ঞ—ইসলামি রাষ্ট্রকে তার সঠিক মাত্রায় এমনভাবে বুঝেছেন, যা অনেক মুসলিম লেখকের চেয়েও উত্তম!

একইভাবে, প্রফেসর হাসান আল-তুরাবির চিন্তাধারাতেও বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। আমরা কেবল সৌজন্যবশতই তাঁর নামের আগে 'প্রফেসর' শব্দটি ব্যবহার করছি, যেভাবে রোমানদের মহান ব্যক্তি বলা হয়। তিনি যখন রাষ্ট্রের ধারণা নিয়ে আলোচনা করেন, তখন ইসলামী রাষ্ট্রকে আধুনিক রাষ্ট্রের প্রচলিত ধারণার ছাঁচে ফেলতে চান। এই লেখক যেমন আধুনিকতাকে তার আসল রূপে তুলে ধরে এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, তুরাবি তেমনটা করেননি। তিনি ইসলামকে আধুনিকতার বিরুদ্ধে একটি বিপ্লবী শক্তি হিসেবে দাঁড় করাননি।

সুতরাং, প্রথম ভিত্তি হলো, এই বইটি ইসলামি রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে। লেখক বলেন, ইসলামে রাষ্ট্র কেবল শরিয়াহর উপর নির্ভর করে না। এ কথা একেবারেই সঠিক। তিনি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং উসূল আল-ফিকহ (ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতি)-এর একজন ভালো পাঠক। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, যারা ইসলামের পুনঃব্যাখ্যা করতে চায়, তাদের দ্বারা 'শরিয়াহ' (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ) শব্দটির ব্যবহার আসলে একটি মিথ্যা শ্লোগান। এর উদ্দেশ্য হলো ইসলামের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে (উলামাদের সিলসিলাকে) বাতিল করে দেওয়া এবং এই অভিজ্ঞতাকে ইসলামের একটি ফসল হিসেবে বিবেচনা করা

থেকে বিরত রাখা। এর ফলে টেক্সট বা 'নস' তার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নগ্ন অবস্থায় থাকে, এবং তখন তাকে নিজেদের মতো করে আকার দেওয়া যায়।

এ কারণেই সালাফিয়্যাহর কিছু ধারা—বিশেষ করে নাজদি সালাফিদের এর উপর প্রভাব বিস্তারের আগে—অনেকের দৃষ্টিতে টেক্সটের বিরুদ্ধে একটি বিপ্লব ছিল। কিছু মরোক্কান, আলজেরিয়ান এবং তিউনিসিয়ান পণ্ডিত বলেন যে, তারা মুহাম্মাদ আবদুহকে সালাফিয়্যাহর ইমাম মনে করতেন! কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বানটি এর কিছু আঙ্গিকে একটি সন্দেহজনক আহ্বান হতে পারে, যদি আমরা এটিকে এর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি।

কোনো টেক্সটের প্রকৃত অর্থ নির্ধারিত হয় বাস্তবতার নিরিখে। যেমন, যখন আমরা 'সাহাবীগণ', 'নবীর জীবন' বা 'খুলাফায়ে রাশিদিনের কর্মজীবন' নিয়ে কথা বলি, তখন বাস্তব অভিজ্ঞতাই আমাদের মানদণ্ড হয়ে ওঠে। এর উদ্দেশ্য হলো, টেক্সটকে বিকৃত করা বা 'ব্যাখ্যা'র নামে খেয়ালখুশিমতো ব্যবহারের প্রবণতা থেকে রক্ষা করা। লেখক যে বিষয়টি বোঝেন, তা স্পষ্ট। তিনি বিষয়টি শুধু বোঝেনই না, বরং তাঁর লেখার বিভিন্ন অংশে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও তা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন।

একারণে লেখক ইসলামি রাষ্ট্রের দুটি মূল ভিত্তি নির্ধারণ করেছেন: প্রথমটি হলো শরীয়াহ বা আইনি বিধান, এবং দ্বিতীয়টি হলো ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা। লেখকের মতে, একটি রাষ্ট্র তখনই ইসলামি হিসেবে পরিচিতি পায়, যখন তা মুসলিমদের মানসে শুধু লিখিত আইন হিসেবে নয়, বরং জীবন্ত বাস্তবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। একারণেই যখন একজন মুসলিম 'রাষ্ট্র' শব্দটি উচ্চারণ করেন, তখন তাঁর মানসপটে সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে আবু বকর, উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান, আলি এবং মুআবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর শাসনকালের চিত্র। লেখক মনে করেন, ইসলামের এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। আর এই মূল্যায়নটি যথার্থ।

এই বইয়ের যুক্তি ও কাঠামোর প্রধান শক্তি হলো ইসলামি রাষ্ট্রের একটি সুস্পষ্ট ধারণা উপস্থাপন করা। লেখক রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করেছেন 'তাওহীদ'-কে, যার অর্থ হলো এক আল্লাহর উপাসনা করা এবং একমাত্র তাঁকেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বা ইলাহ হিসেবে মেনে নেওয়া। লেখক বইটিতে সরাসরি আখিরাত নিয়ে আলোচনা না করলেও এর চেতনা পুরো লেখায়ই বিদ্যমান। এর কারণ হলো, ইসলামি রাষ্ট্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একচ্ছত্র আধিপত্য বা 'ইলাহিয়্যাত'-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর শরীয়াহ এই গভীর বিশ্বাসের সাথেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ফলে, ইসলামি রাষ্ট্রে শরীয়াহ বাস্তবায়নের পেছনে একজন মুসলিমের মূল অনুপ্রেরণা আসে এই গভীর উপলব্ধি থেকে যে, সে আল্লাহর একজন দাস বা বান্দা। সুতরাং, এটি সম্পূর্ণরূপে একটি নৈতিক দায়বদ্ধতার বিষয়।

বইজুড়ে লেখক একটি চমৎকার পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন: দর্শন তার সকল প্রচেষ্টা দিয়েও নৈতিক মূল্যবোধ তৈরি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এর কারণ, দর্শনের সেই 'ভার' (ثقل) বা ওজন নেই, যা নৈতিক মূল্যবোধকে মানুষের অন্তরে এক কার্যকর শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে।

এভাবেই তিনি সেসব দার্শনিকদেরকে বাতিল করে দেন, যারা ব্যক্তিগত উপলব্ধির ঊর্ধ্বে গিয়ে কোনো সার্বজনীন নৈতিকতার কথা বলেন—এই পর্যবেক্ষণ অস্তিত্ববাদী থেকে শুরু করে সকল দার্শনিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। লেখকের মতে, কোনো দার্শনিকের পক্ষেই নৈতিক ভিত্তির ওপর একটি জীবন্ত ও কার্যকর রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, কোনো দর্শনই নৈতিক মাত্রা সম্পন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। এর কারণ কী? কারণ, দর্শন হলো 'নফসের সৃষ্টি' (production of the Self) বা মানুষের নিজস্ব চিন্তার ফসল। অন্যদিকে, কুরআনের বাণী বা 'নস' আসে সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে। মানুষের তৈরি কোনো ব্যবস্থা সেই চালিকাশক্তি যোগাতে পারে না, যা দিয়ে বাস্তবতার কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নৈতিকতার ভার বহন করা যায়।

কাজেই, যে ব্যক্তি মনে করে ধর্মনিরপেক্ষতা বা তার সমার্থক আধুনিকতা, কোনো নৈতিক ভিত্তি সম্পন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামরিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সে নিঃসন্দেহে বিভ্রান্ত। এটি ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ ইসলামি রাষ্ট্র একটি ঐশী ব্যবস্থা, যা আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়াহর উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিকতা ও ইসলামের মধ্যে মূল সংঘাত ও বিভেদ ঠিক এখানেই।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষে এ ধরনের কথা সাধারণত তারাই বলেন, যাদের 'চরমপন্থী' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। আধুনিকতা ও ইসলাম যে কখনো এক হতে পারে না, এবং কোনো নাগরিক, দার্শনিক বা আধুনিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে যে ইসলামি রাষ্ট্র গড়া সম্ভব নয়—এই কথাগুলো সাইয়্যেদ কুতুব বা তাঁর মতো চিন্তাবিদরাই বলে থাকেন। অথচ বর্তমানে যারা ইসলামের রাজনৈতিক দিক নিয়ে কথা বলেন, তাদের অধিকাংশই জাহেলিয়াতকে ইসলামের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে একীভূত করতে চান।

লেখক এর চেয়েও গভীরে গিয়ে আলোচনা করেছেন। বইয়ের শেষ অধ্যায়গুলোতে তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি মনে করে আধুনিক রাষ্ট্র একটি নিরপেক্ষ কাঠামো, যাকে যেকোনো মতাদর্শ দিয়ে চালিয়ে নেওয়া যায়, সে বিভ্রান্ত ও অজ্ঞ।" গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, লেখক একজন গবেষক হিসেবে পাণ্ডিত্যপূর্ণ (scholarly) দৃষ্টিকোণ থেকে কথাগুলো বলছেন, ফলে তাঁকে গোঁড়ামির দায়ে অভিযুক্ত করার সুযোগ নেই। অথচ বর্তমানে অনেক মুসলিম ঠিক এই ভুলটিই করছে। তারা বিদ্যমান আধুনিক রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই কাজ করে এর ভেতরে ইসলামকে স্থাপন করতে চাইছে। তারা সংসদে যোগ দিয়ে বা আধুনিক রাষ্ট্রের বৃত্তের মধ্যেই সংস্কারের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। লেখকের মতে, এই লোকেরা অজ্ঞ।

তিনি এই কথাগুলো মিসরে মুরসির পতন বা তিউনিসিয়ায় আন-নাহদা পার্টির অভিজ্ঞতার পরে লিখেছেন কি না, তা আমার জানা নেই। তবে অনুবাদক যে এই অভিজ্ঞতাগুলোর পতনের পরেই বইটি অনুবাদ করছেন, তা স্পষ্ট। যদিও এটি আমাদের মূল আলোচনার বিষয় নয়।

লেখক আবারও ইসলামের সেই মূল ধারণায় ফিরে এসেছেন যে, ইসলাম একটি নৈতিক ব্যবস্থা, যা মানুষ আল্লাহর বান্দা—এই পরিচয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অন্যদিকে, সমসাময়িক রাষ্ট্র হলো মানবীয় 'নফসের' সৃষ্টি। মানুষের তৈরি কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে কখনোই প্রকৃত নৈতিক মাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ নৈতিকতা একধরণের 'ভার', যা স্বার্থপর মানুষের পক্ষে বহন করা কঠিন।

সংক্ষেপে, কোন জিনিসটি একজন মুসলিমকে আল্লাহর এই বাণী— {তবে তার সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও}—মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করে? একমাত্র আল্লাহভীতি। যদি আল্লাহর প্রতি দাসত্বের প্রেক্ষাপট থেকে এই নির্দেশকে সরিয়ে ফেলা হয়, তবে কোনো মানুষই স্বেচ্ছায় তা পালন করবে না। আমি কেন তাকে অবকাশ দেব? কেন {ক্ষমা করে দেওয়া তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী}?

সুতরাং, এই লেখক যেমন ইসলামি রাষ্ট্রের মর্ম উপলব্ধি করেছেন, তেমনি আধুনিকতার সারমর্মও অনুধাবন করতে পেরেছেন। এই দুটি স্তম্ভই তাঁর বইয়ের গাণিতিক কাঠিন্য ও যুক্তির ভিত্তি। তৃতীয় যে বিষয়টি তিনি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন, তা হলো বইটির যৌক্তিক ধারাবাহিকতা। তিনি তাঁর যুক্তিকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে অনুসরণ করেছেন। তাঁর সূচনা যেমন ছিল বিস্ময়কর, সমাপ্তি ছিল তার চেয়েও বেশি চমকপ্রদ।

অনেকের হয়তো ধারণা হতে পারে, লেখক বলতে চাইছেন যে ইসলাম পরিবর্তন আনতে অক্ষম, কিন্তু তিনি তা বলেননি। অনেকে ভাবতে পারেন, লেখক মনে করেন ইসলাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম নয়, কিন্তু তিনি তাও বলেননি। বরং তিনি বলেছেন, যদি মুসলিমরা এই যুগে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে তাদের অবশ্যই শক্তি অর্জন করতে হবে। তাদের আত্মিক শক্তি, সৃজনশীলতা এবং সক্ষমতা থাকতে হবে। আধুনিকতাকে অতিক্রম করার জন্য তাদের এই অপরিমেয় সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তিনি এই কথা বলেন কারণ আধুনিকতা কোনো নিরপেক্ষ বা নির্মল ব্যবস্থা নয়। বরং এটি সহিংস, আগ্রাসী এবং প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মতো সব উপকরণেই সজ্জিত।

তাহলে লেখকের মতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপায় কী? তিনি স্বীকার করেন যে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। লেখকের এই মূল্যায়নগুলোই বইটির মূল ভিত্তি। আর এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য বইয়ের প্রতিটি অনুচ্ছেদ আপনাকে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে।

বইয়ের শুরুতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা হলো 'কেন্দ্রিকতা' (আল-মারকাযিয়্যাহ)। লেখক প্রায় ছয়-সাত পৃষ্ঠা জুড়ে—যা এই বইয়ের বিবেচনায় বেশ দীর্ঘ—এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, যতক্ষণ বিশ্ব একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বা নির্দিষ্ট প্যারাডাইম দ্বারা শাসিত হবে, ততক্ষণ এর ভেতর থেকে ভিন্ন কোনো ধারা বা স্বতন্ত্র সত্তা গড়ে ওঠা অসম্ভব। আধুনিকতার এই প্যারাডাইমটি হলো নৈতিকতা ও মূল্যবোধহীন একটি ব্যবস্থা। সুতরাং, এমন একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থার ভেতরে থেকে একটি উত্তর-আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণাটি একেবারেই অসম্ভব।

লেখকের এই মূল্যায়নটি অত্যন্ত যৌক্তিক। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো সুদ (রিবা)। বর্তমানে এমন একটি মুসলিম রাষ্ট্র খুঁজে পাওয়া কঠিন, যা সুদের ওপর নির্ভরশীল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধীন নয়। (আমরা অতীতে ইসলামি স্বর্ণ-দিনার প্রতিষ্ঠার অবাস্তব ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, আপনারা চাইলে সেটি দেখে নিতে পারেন।)

এই বক্তব্যটি 'The Fourth World War' বইয়ের লেখকের কথার সঙ্গে মিলে যায়। তিনি বলেছিলেন, "প্রাচ্যের জগৎ থেকে আমরা এমন কোনো নেতার আবির্ভাবকে ভয় করি, যিনি বিশ্বের প্রচলিত দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশের বাইরে গিয়ে কাজ করবেন।" বস্তুত, এভাবেই একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যদিও লেখক বিষয়টি সরাসরি উল্লেখ করেননি, তবে তিনি দার্শনিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, এই আন্তঃসংযুক্ত ব্যবস্থার ভেতরে থেকে ইসলামের মহান আদর্শের ওপর ভিত্তি করে কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। লেখক একে 'আধুনিকতা' বললেও আমরা একে 'জাহেলিয়াত' বলি। তিনি এই বিষয়ে দীর্ঘ ও গভীর আলোচনা করেছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা একটি ড্রাগনের মতো, যার তিনমাত্রার মূল চালিকাশক্তি অর্থনীতি। আর এই অর্থনীতিরূপী মাথাটিই হলো ড্রাগনটির সবচেয়ে বড়, ধ্বংসাত্মক এবং কদর্য অংশ। তাই এই ব্যবস্থা থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাওয়া অপরিহার্য। এর ভেতরে থেকে কোনো মিশ্র বা সংকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

আমি আবারও বলছি, লেখক কোনো হতাশাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কথাগুলো বলেননি, যা মানুষকে নিরাশা বা কুফরির দিকে ঠেলে দেয়। বইটির প্রতিটি বাক্যই গুরুত্বপূর্ণ। লেখক যদি একটি নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদে বিষয়টি স্পষ্ট না করতেন, তাহলে হয়তো আমিও ভাবতাম তিনি মুসলিমদের বলছেন: "তোমরা হাল ছেড়ে দাও। এই বিশ্ব নিষ্ঠুর, আধুনিকতা এক অপরাধী ব্যবস্থা, আর তোমরা দুর্বল ও নৈতিক। সুতরাং তোমরা কখনোই জয়ী হতে পারবে না।" দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলিম ঠিক এমন কথাই বলে। এমনকি জিহাদি ধারার অনুসারীদের মধ্যেও

এ ধরনের হতাশা কাজ করে। যখন তাদের প্রশ্ন করা হয়, "অমুক অভিযানটি কেন সফল হলো না?" তখন তারা নিজেদের নৈতিকতাকে দোষারোপ করে। তারা বলে, নৈতিকতা তাদের হাত-পা বেঁধে রেখেছিল, অথচ তাদের অনৈতিক প্রতিপক্ষ কোনো সীমানা না মেনে ঠিকই লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে।

এমন কথা তো প্রায়ই শোনা যায়, তাই না? কেউ বলে, "অমুক দল কেন জিতেছে? কারণ তাদের কোনো নৈতিক সীমাবদ্ধতা ছিল না।" এমনকি সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়া লোকেরাও বলে, "আমরা জিততে পারতাম, কিন্তু প্রতিপক্ষ ঘুষ দিয়েছে, মিথ্যা বলেছে, আনুগত্য কিনে নিয়েছে এবং প্রতারণা করেছে। আর আমরা নৈতিক মূল্যবোধে অটল ছিলাম। শেষ পর্যন্ত এই নৈতিকতাই আমাদের সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে এবং এই সীমাবদ্ধতাই আমাদের পরাজয়ের কারণ হয়েছে!"

আমি জানি না, আমাদের এই যুগে এর চেয়ে মারাত্মক অপরাধমূলক কথা আর কী হতে পারে! এই ধারণাটি আল্লাহ তাআলার বাণীর সরাসরি বিরোধী, যেখানে তিনি বলেন: {নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধরে, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কখনো নষ্ট করেন না} (ইউসুফ: ৯০)। এটি আল্লাহর এই কথারও বিরোধী: {সুতরাং ধৈর্য ধারণ করুন। নিশ্চয় শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্যই} (হুদ: ৪৯)। কুরআন বলছে, শেষ পর্যন্ত সাফল্য মুত্তাকিদের জন্যই নির্ধারিত, আর আপনি কি না বলছেন যে তাকওয়ার সীমাবদ্ধতার কারণে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেননি!

এই ধরনের চিন্তাভাবনা এক ধরনের হতাশার জন্ম দিয়েছে, যার ফলে কেউ কেউ হাল ছেড়ে দিয়েছে। তাদের যুক্তিটি অনেকটা এমন: "যতদিন আমার শত্রু তার কুটিল ও জাহেলি পদ্ধতি ব্যবহার করবে, আর আমি নৈতিকতার গণ্ডিতে বাঁধা থাকব, ততদিন তো তারই জয় হবে। প্রতিটি যুদ্ধেই হার আমার হবে।"

এই হতাশা থেকে জন্ম নিয়েছে দুটি ভুল পথ। প্রথম দলটি মনে করে, 'আমাদের পক্ষে জয়লাভ সম্ভব নয়', তাই তারা এক গায়েবি নিদর্শনের অপেক্ষায় নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে। তারা এমন এক ত্রাণকর্তার অপেক্ষায়, যিনি আসমানি শক্তি দিয়ে জমিনের শক্তিকে পরাজিত করবেন। তারা অলৌকিক ঘটনা আর গায়েবি সাহায্যের অপেক্ষায় করছে।

এর বিপরীতে, দ্বিতীয় দলটি শত্রুদের মতোই পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা দেখেছে যে, নিজেদের নৈতিক আদর্শ দিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাচ্ছে না। তাই তারা ভিন্ন পথ ধরেছে এবং নিজেদের কাজের ইসলামি ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে। তারা প্রতিপক্ষের কৌশলই গ্রহণ করেছে, শুধু তার ওপর একটি ইসলামি আবরণ পরিয়ে দিয়েছে। 'নবী (ﷺ) বলেছেন...', 'যুদ্ধ মানেই কৌশল', 'এটা জায়েজ আছে'—এইসব বলে তারা অনৈতিক জাহেলিয়াতকেই ইসলামের নামে জায়েজ করতে শুরু করেছে।

এজন্যই আমাদের জন্য কুরআন ও রাসুল (ﷺ)-এর সিরাত অধ্যয়ন করা অপরিহার্য। কারণ নবীরা নৈতিক পথেই নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন। রাসুল (ﷺ)-এর জীবনই এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ—তিনি ইসলামের মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করেই চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তিনি কখনো এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করেননি, যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। বরং তিনি নিজের নৈতিক আদর্শে অটল থেকেই বিজয়ী হয়েছিলেন।

সুতরাং, কোনো লেখক যখন বলেন যে, আধুনিকতার এই কদর্য বাস্তবতার মধ্যে ইসলামের মতো একটি মহান নৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, তখন তা হতাশাজনক মনে হতে পারে। কিন্তু এই বইটি মোটেও তা বলে না। আমি বইটিকে এই অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে চাই। লেখক স্বীকার করেন যে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, তবে প্রতিপক্ষের সাথে সংগ্রাম হবে অত্যন্ত তীব্র। তিনি মানুষকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকে নিরাশ করেন না। বইটির পূর্ণাঙ্গ শিরোনামই এর প্রমাণ: 'ইসলাম, রাজনীতি এবং আধুনিকতার নৈতিক সংকট'। সমস্যা ইসলামে নয়, বরং আধুনিকতার নৈতিক সংকটে।

বইটির প্রতিটি বাক্য ও অনুচ্ছেদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বইটি পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, লেখক উসুল আল-ফিকহের একজন গভীর পাঠক। আমি জানতে পেরেছি, তিনি ইসলামি মূলনীতি ও শিক্ষার অধ্যাপক এবং ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য রয়েছে। তিনি উসুল আল-ফিকহের সুদৃঢ় কাঠামোর যে প্রশংসা করেছেন, তা কোনো ফাঁকা বুলি নয়, বরং তাঁর গভীর জ্ঞানেরই পরিচায়ক। এতে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেছে।

বইটি মূলত আমাদের জন্য লেখা হয়নি। এটি একটি বিশেষায়িত একাডেমিক গবেষণা হিসেবে ইংরেজিভাষী পাঠকদের জন্য লেখা হয়েছিল; আমরা এর মূল টার্গেট অডিয়েন্স ছিলাম না। এখন আমি বইটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশে আলোচনা করবো। বইটি উসুল আল-ফিকহের কিতাবগুলোর মতো, যার প্রতিটি অনুচ্ছেদের বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আমার কথাগুলো প্রমাণ করার জন্য চলুন কিছু অংশ পড়া যাক। আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি পড়ব, যা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অসম্ভবতা নিয়ে যেকোনো ভুল ধারণা দূর করে দেবে। তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না—এমন কথা বলছেন না; কিন্তু তাঁর শর্তটি লক্ষ্য করুন।

তিনি বলেন: "সুতরাং, নফসের প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে..." আমাদের এক ভাই উল্লেখ করেছেন যে, লেখককে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি "নফসের প্রযুক্তি"—এর অর্থ হিসেবে 'তাকওয়া' (আল্লাহভীতি) ব্যাখ্যা করেছিলেন। সত্যি বলতে, আমার ধারণা তিনি বিষয়টি সহজভাবে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু এর জন্য এমন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, কারণ মূল বিষয়টি পাঠ থেকেই স্পষ্ট। বাস্তবে, 'তাকওয়া' শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ থাকতে পারে, যা তিনি ইংরেজিতে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু একে যদি আক্ষরিকভাবে ইসলামি ভাবধারায়

অনুবাদ করা হয়, তবে তা এই বাক্যের জ্ঞানগত গভীরতা পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারবে না।

পাশ্চাত্যে 'তাকওয়া' শব্দটি হয়তো রাসূল (ﷺ)-এর একটি উক্তির ভিত্তিতে নিজ কাজে আন্তরিকতা ব্যাখ্যা করা হয়, যেখানে তিনি বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজ করে, তখন সে তা নিপুণতার সাথে করুক—এটা আল্লাহ ভালোবাসেন।" এর ফলে, তাকওয়াকে প্রায়ই নিজ কাজে আন্তরিকতা বা নিপুণতা হিসেবে অনুবাদ করা হয় হয়। কিন্তু 'তাকওয়া'কে কেবল "আল্লাহভীতি" হিসেবে অনুবাদ করলে এর মূল ভাবটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কারণ ইসলামি পরিভাষায় 'তাকওয়া' শব্দটি 'নুসুক' বা ইবাদত-কেন্দ্রিক সাধনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কাজে নিপুণতা তাকওয়ার একটি অংশ হতে পারে, কিন্তু তাকওয়া বলতে সাধারণত একে বোঝানো হয় না। বরং ইসলামি পরিভাষায় শব্দটি এমন একজন ইবাদতকারি বা আবিদের সাথে যুক্ত, যিনি সালাত, সাওম, যাকাত ও হজের মতো ইবাদতগুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।

লেখক বলেন: "সুতরাং, নফসের প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে কোনো কিছু নির্মাণ করাকে প্রাক-আধুনিক শরিয়াহর প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনরুদ্ধার হিসেবে দেখা যায় না..." সত্যি বলতে, বইটি পড়ার আগে আমি চেয়েছিলাম এটি খারাপ হোক, যাতে এর কঠোর সমালোচনা করা যায়। কিন্তু লেখক তাঁর পরিশীলিত ভাষা দিয়ে নিজের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এটি পড়ার পর ইসলাম নিয়ে যারা আজকাল লেখালেখি করেন, তাদের জন্য আমার আফসোস হয়, কান্না পায়। সাইয়্যেদ কুতুব, আবুল আ'লা মওদুদী, মালেক বিন নাবী—তাঁরা আজ কোথায়? আমরা তাঁদের হারিয়ে ফেলেছি। ইসলাম নিয়ে এমন গভীর ও প্রাণবন্ত আলোচনা, লেখার মধ্যে সেই শক্তি এবং ইসলামের বাস্তবতা নিয়ে এমন সজাগ উপলব্ধি আজকের দিনে আর চোখে পড়ে না।

রাশিদ আল-ঘানুশি তাঁর 'ইসলামি রাষ্ট্রে নাগরিক স্বাধীনতা' বইতে রাষ্ট্রকে মানবিক রূপ দিয়েছেন। আমি আপনাদের প্রশ্ন করতে চাই, রিদ্দার যুদ্ধ কেন হয়েছিল? তা কি সরকারের অধিকার রক্ষার জন্য সংঘটিত হয়েছিল, নাকি আল্লাহর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য? জিহাদ পরিচালিত হয় আল্লাহর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। এর উদ্দেশ্য হতে পারে কাফেরদের আল্লাহর পথে আহ্বান জানানো কিংবা ধর্মত্যাগীদের (মুরতাদ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, কারণ তারা আল্লাহর দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এটি একটি মৌলিক ধারণা, যা প্রত্যেক মুসলিম জানে। অথচ হাসান আল-তুরাবির মতো চিন্তাবিদ দাবি করেন, আবু বকর (রা.) রিদ্দার যুদ্ধ করেছিলেন 'ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা' রক্ষার জন্য। তাঁর ভাষ্যমতে, রাষ্ট্র এমন এক সত্তায় পরিণত হয়, যেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া রোধ করার জন্য যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড চালানো যায়। রাষ্ট্র কি নিজেই একটি লক্ষ্য? একটি দানব, যার পূজা করতে হবে? এর বিপরীতে আরেকজন বলেন:

রাষ্ট্র নিজে কোনো লক্ষ্য নয়, বরং তা পৃথিবীতে আল্লাহর অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম মাত্র।

কোন অনুভূতিটি ইসলামের চেতনার সঙ্গে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ? সেই ব্যক্তির কথা, যিনি বলেন মুসলিম রাষ্ট্রের একটি মানবিক মাত্রা রয়েছে? নাকি তার কথা, যিনি বলেন মুসলিম রাষ্ট্র এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত: {বলুন, 'নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন এবং আমার মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য'} (আল-আনআম: ১৬২)? নিঃসন্দেহে, সেই ব্যক্তিই ইসলামের স্পিরিটের কাছাকাছি, যিনি বলেন—ইসলামি রাষ্ট্র কুরআন ও সুন্নাহর ফসল। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আল্লাহর এই বাণী বাস্তবায়ন করা: {আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি} (আয-যারিয়াত: ৫৬)।

তাহলে ইসলামের কাছাকাছি কে—ওয়ায়েল হাল্লাক, নাকি তারা, যারা রাষ্ট্রকে একটি মানবিক রূপ দিয়ে শরিয়াহ থেকে বিচ্যুত করতে চায়? আর যদি শরিয়াহ প্রয়োগ করেও, তবে তা করে কেবল এর সংকীর্ণ নৈতিকতার জন্য, এর মূল ভিত্তি—অর্থাৎ আল্লাহর দাসত্ব—প্রতিষ্ঠার জন্য নয়।

ইসলাম এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যকার গভীর পার্থক্য অনুধাবনে এই লেখক অত্যন্ত বিচক্ষণ। উদাহরণস্বরূপ, তিনি 'যুক্তি'র (reason) ধারণার দিকে দৃষ্টি দেন। গ্রিক ও মুসলিমদের মধ্যে 'যুক্তি'র ধারণাগত পার্থক্য না বুঝলে এই বই এবং এর লেখককে বোঝা প্রায় অসম্ভব। লেখক তার বিষয়ের উপর গভীর পাণ্ডিত্য রাখেন, কিন্তু তিনি কোনো আকর্ষণীয় ধারণা উপস্থাপন করে বীরত্ব জাহির করতে চান না। তার লেখার মধ্যে এমন অনেক ধারণা পাওয়া যায়, যা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মনে হলেও লেখকের গভীরতারই পরিচায়ক। আমি এখানে কোনো মুসলিমের নয়, বরং একজন খ্রিস্টান ব্যক্তির প্রশংসা করছি—যিনি আধুনিকতায় বিশ্বাসী না। আমি জানি না তিনি ব্যক্তিগত জীবনে কেমন, তবে তিনি ফিলিস্তিনের একজন খ্রিস্টান হিসেবে পরিচিত।

এবং আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, এমন দক্ষতা ও কাঠামোগত গভীরতা নিয়ে লেখা কোনো ইসলামি রচনা আমার চোখে পড়েনি। এই লোকটি বোঝে। তিনি যদি একজন জুমার খতিব হতেন, তবে মুসল্লিরা হয়তো বলত, তিনি আমাদের হতাশ করছেন বা বীরত্বের ফাঁপা বুলি আওড়াচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি চান, মুসলিমরা পরিবর্তনের জন্য এক কিংবদন্তিতে পরিণত হোক—ইতিহাস পরিবর্তনকারী মহান ব্যক্তিত্বদের মতো।

তিনি বলেন: "সুতরাং, 'নফসের প্রযুক্তি' (technologies of the self) বা আত্মার গঠন-কৌশলের উপর ভিত্তি করে কোনো কিছু নির্মাণ করার অর্থ এই নয় যে, প্রাক-আধুনিক শরিয়াহর প্রতিষ্ঠান, তার অনুশীলন বা শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে।" আমি যদি শুধু এই বাক্যটি আপনাদের সামনে বলতাম, তাহলে আপনারা হয়তো ভাবতেন, লোকটি

আজকের দিনের অনেক শাইখের মতোই কথা বলছে। অনেক শাইখ, চিন্তাবিদ এবং এমনকি সালাফি হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিরাও বলেন: "ইসলামি ফিকহ একটি ঐতিহাসিক সৃষ্টি, যা এখন আমাদের কোনো কাজে আসবে না! সেই ফিকহ তখনকার যুগের জন্য উপযুক্ত ছিল। আমাদের এখন নতুন ফিকহ ও নতুন সৃজনশীলতা প্রয়োজন!" আপনি যদি কেবল এই বাক্যে থেমে যেতেন, তাহলে ভাবতেন, লেখকও তাদেরই একজন, যারা বলতে চায় সৃজনশীলতা আত্মার গঠন-কৌশল থেকেই আসে।

তিনি আরও বলেন: এর অর্থ অতীতে যেমন ছিল, ঠিক তেমন একটি মুসলিম রাষ্ট্রের চিত্র পুনঃনির্মাণ করাও নয়। এ পর্যন্ত তার কথা তাদের সাথে মিলে যায়। মনে হতে পারে, তিনি বলতে চাইছেন যে ইসলামি রাষ্ট্রের বিবর্তন প্রয়োজন, কারণ এর ঐতিহাসিক রূপটি পুরোনো হয়ে গেছে।

কিন্তু এরপর তিনি যা বলেন, তাতেই তার চিন্তার সততা ফুটে ওঠে: "সুতরাং, 'নফসের প্রযুক্তি'র উপর ভিত্তি করে নির্মাণ করা কোনোভাবেই প্রাক-আধুনিক শরিয়াহর প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনরুদ্ধার বোঝায় না। কারণ এটি প্রথমত এবং সর্বাগ্রে একটি নৈতিক প্রকল্প।" যে ইসলামি রাষ্ট্র আপনি কল্পনা করছেন, যা দিয়ে আধুনিকতাকে প্রতিস্থাপন করবেন, তা সর্বপ্রথম একটি নৈতিক প্রকল্প হতে হবে। এটি হতে হবে এক নতুন সৃষ্টি।

তবে তিনি ইতিহাসকে উপেক্ষা করেন না, বরং গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন: "এটি নৈতিক নির্দেশনার জন্য ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে নির্মাণের একটি প্রচেষ্টা। এটি নৈতিক সমালোচনা, প্রতিফলন এবং বিকল্প অনুসন্ধানের একটি প্রকল্প। এর লক্ষ্য হলো, আধুনিক বিশ্বে মুসলিম আত্মার জন্য একটি নৈতিক পরিসর তৈরি করা।" তিনি আজকের মুসলিমদের বিচ্ছিন্নতার কথা বলেন: হে মুসলিম, আপনি কি বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেন না? মাংস কিনতে গিয়ে, কোনো চুক্তি করতে গিয়ে, বা বিয়ে করতে গিয়ে—আপনি কি বিচ্ছিন্নতায় ভোগেন না? যখন আপনি একজন প্রতিশ্রুতিশীল মুসলিম হিসেবে কোনো অনুষ্ঠানে যান এবং সেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা দেখেন, তখন কি আপনার নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয় না?

তিনি এই মুসলিম আত্মা সম্পর্কে বলেন: "এটি এমন এক আত্মা, যা আধুনিকতার ফলস্বরূপ তার পশ্চিমা প্রতিপক্ষের চেয়ে কম বিচ্ছিন্ন নয়।" আধুনিকতা যখন পশ্চিমা মানুষকে তার ঐতিহ্যবাহী সমাজ থেকে বের করে দিয়েছিল, তখন সেও বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেছিল। লেখক বলেন, একটি উত্তর-আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য আপনার আকাঙ্ক্ষা এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ—এর সবই আপনার আগে তারাও অনুভব করেছিল, যারা আধুনিকতার মাধ্যমে তাদের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

“এই ভিত্তিতে, ইসলামি নৈতিক উৎসগুলোর পুনরুদ্ধার এমন একটি প্রকল্প, যা আধুনিকতার মতোই আধুনিক।” আধুনিকতা যেমন পশ্চিমা সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে একটি বিপ্লব ছিল এবং জীবনের ভিত্তিকেই বদলে দিয়েছিল, লেখক বলেন, আপনি যদি একটি ইসলামি রাষ্ট্র চান, তবে আপনাকেও ঠিক তাই করতে হবে—অর্থাৎ, আধুনিকতার ভিত্তিগুলোকেই ধ্বংস করে দিতে হবে। “এটি মৌলিকভাবে একটি উত্তর-আধুনিক প্রকল্পও বটে। আরও পরিষ্কার করে বললে, উত্তর-আধুনিকতা আধুনিকতাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি আধুনিকই থেকে যায়।”

এই পাঠ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, একটি ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসের অর্থ কী—এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে সুদ নেই, স্যাটেলাইট ডিশের নোংরামি নেই এবং যেখানে নৈতিক জীবনযাপন করা সম্ভব। লেখকের মতে, এমন একটি পরিবেশ তৈরি করাই রাষ্ট্রের ভূমিকা। এর অর্থ হলো, রাষ্ট্রকে বিশ্বের অন্য নিয়ন্ত্রক শক্তিগুলোর চেয়ে বেশি ক্ষমতাধর হতে হবে; এর অবশ্যই المواجهة (মুখোমুখি হওয়ার) ক্ষমতা থাকতে হবে। এটিই সঠিক উপলব্ধি। আমি নিশ্চিত, এই কথাগুলো লেখার পর লেখক নিজেও হয়তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন!

আমি মাঝে মাঝে মুসলিমদের সরলতা দেখে হাসি। যেমন, তাবলীগ জামাআতের ভাইয়েরা প্রায়ই বলেন: “কাফেররা আমাদের খাবারে শূকরের চর্বি মিশিয়ে দেয়, যাতে আমাদের দুআ কবুল না হয়! তারা আমাদের নারীদের জন্য খোলামেলা পোশাক তৈরি করে, যাতে আমাদের সালাত কবুল না হয়।” আল্লাহর কসম, কারখানা যখন এসব পণ্য তৈরি করছিল, তখন আপনার কথা তাদের একবিন্দুও মনে ছিল না। এই ধারণাটি কেবল আপনাদের মনগড়া।

লেখক স্বীকার করেছেন যে, পশ্চিমারা ইসলামকে ভয় পায়। তাই তারা ইসলামি বিশ্বকে পুরোপুরি নিজেদের ব্যবস্থার অধীনে আনার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। এর উদ্দেশ্য ছিল, ইসলাম যেন তার নিজস্ব পরিবেশে স্বতন্ত্র কোনো ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারে। ঔপনিবেশিক শক্তি কেবল আমাদের শোষণই করতে চায়নি, বরং ইসলামি বিশ্বকে তাদের ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে একটি নৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থাকেই রোধ করতে চেয়েছিল। কারণ আধুনিকতা নৈতিক উৎপাদনের শত্রু।

এই ধরনের বই সাধারণত প্রাচ্যবাদের স্বরূপও উন্মোচন করে দেয়। কিন্তু আমি এতে প্রাচ্যবাদী মনোভাব খুঁজে পাইনি। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, ইসলামকে একটি জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ধারণাটি হয়তো প্রাচ্যবাদী। কিন্তু পরে দেখলাম, লেখক একটি পুরো অধ্যায় উৎসর্গ করেছেন জাতীয়তাবাদী কাঠামোর মধ্যে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে খণ্ডন করার জন্য। তিনি বলেন, ইসলাম জাতীয়তাবাদের শত্রু। এর সার্বজনীন নৈতিক মাত্রা ইসলামকে জাতীয়তাবাদী হতে বাধা দেয়, যা আধুনিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বের অন্যতম ভিত্তি।

তথাকথিত আধুনিকতার প্রতি তার চেয়ে বেশি বিদ্বেষী কোনো ব্যক্তিকে আমি দেখিনি। আমি তার সমকক্ষ পেয়েছি, কিন্তু কাউকে তার চেয়ে বড় পাইনি। তিনি আলোকায়ন (Enlightenment) এবং আধুনিকতার (Modernity) মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তার মতে, আধুনিকতা হলো আলোকায়নের শত্রু। যদি আধুনিকতা আলোকায়নের ধারণার সাথে একমত হতো, তবে এটি একটি ইসলামি রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে মেনে নিত। কারণ মানুষ ইসলামকে বেছে নিয়েছে, তাহলে আপনি কেন তাদের বঞ্চিত করতে চান? আলোকায়নের অর্থ হলো স্বাধীনতা—মানুষ যা চায়, তা বেছে নেওয়ার অধিকার। কিন্তু আধুনিকতা একটি তাগুত, যা কেবল নিজের উপাসনারই অনুমতি দেয়।

লেখক এখানে বুঝতে পেরেছেন যে তার কথাগুলো বেশ কঠিন এবং বিপ্লবের আহ্বানের মতো শোনাচ্ছে। তার যুক্তি অনুযায়ী, যদি আপনি একটি ইসলামি রাষ্ট্র গড়তে চান, তবে আপনাকে পুরো বিশ্বব্যবস্থাকেই ধ্বংস করতে হবে; আপনাকে বিশ্বের কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। তিনি বলেন: "এই প্রকল্পটির ব্যাপারে অবশ্যই অনেক ভাষ্যকার প্রশ্ন তুলবেন, বিশেষ করে যারা পশ্চিমা উদারনৈতিক ঐতিহ্য এবং এর মূল্যবোধে অভ্যস্ত।" তাহলে এই বইয়ের শত্রু কারা? যারা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ (secular) ও উদারনৈতিক (liberal) বলে দাবি করে।

লেখক আরও বলেন, "এই প্রকল্পটির ব্যাপারে অবশ্যই অনেক ভাষ্যকার প্রশ্ন তুলবেন... এবং তারা একে—বা অন্তত এর প্রস্তাবককে—পশ্চাৎপদ হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করবে। আমি বিশ্বাস করি যে এই দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডন করার জন্য পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে অনেক কিছুই বলা হয়েছে।" লেখকের বক্তব্য হলো, ইসলাম একটি নৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করে, এবং আলোকায়নের নীতি অনুযায়ী এর অনুমতি থাকা উচিত।

"তবে, একদল সংশয়বাদী রয়ে গেছে, যাদের নৈতিক পুনরুজ্জীবনের ইসলামি প্রকল্পের প্রতি প্রতিক্রিয়া হলো এই যে, এই প্রকল্পটি পশ্চাৎপদ এবং আধুনিক বিশ্বে এর কোনো স্থান নেই।"

তিনি বলেন: "অতএব, এখন তাদের উপর আবশ্যক হলো এই অভিযোগের ব্যাপারে চিন্তা করা এবং এর বুদ্ধিবৃত্তিক ও পদ্ধতিগত প্রভাবগুলো উন্মোচন করা।" এরপর তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে থাকেন।

আধুনিকতাবাদীদের প্রতি তার আতঙ্ক বোঝাতে তিনি বলেন, কেউ কেউ অতীতমুখী নৈতিক ভিত্তির আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে, এমনকি যদি সেই ভিত্তি আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জরুরিও হয়-তাও। তারা যুক্তি দেখায় যে, আধুনিকতার মধ্যেই স্ব-সংশোধনের উপাদান রয়েছে।

কিন্তু এই প্রকল্পের আসল শত্রু কারা, তা জানতে বইটিতে তার শেষ বাক্যটি দেখুন। "কোনো সন্দেহ নেই যে বাস্তবে যা কল্পনা করা হচ্ছে তা একটি শ্রমসাধ্য কাজ। এটি ইউটোপিয়ান বা অবাস্তব মনে হতে পারে... তবে, আধুনিকতার নৈতিকভাবে সমালোচনা করা এবং এর পুনর্গঠন কেবল একটি ইসলামি শাসনের প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, বরং আমাদের বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক টিকে থাকার জন্যও একটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা। সংকটটি কেবল ইসলামি শাসন এবং মুসলিমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।" তিনি বলতে চেয়েছেন, নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে একটি সত্যিকারের আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামের মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। বাকি সব ব্যবস্থা মানুষের তৈরি, যা সত্যিকারের নৈতিক মাত্রা তৈরি করতে পারে না।

সপ্তম অধ্যায়ে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য বলেছেন: "নৈতিকতার কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র।"

পুরো বই জুড়ে তিনি কোনো ইসলামি দল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিত্বের প্রস্তাবনার কথা বলেননি। হয়তো তিনি আমাদের কার্যকলাপ দেখেন নি, তবে কিছু ঘটনার হালকা সমালোচনা করেছেন।

"আমরা এখানে স্বীকার করব যে যদিও এই সমস্যাগুলো গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগত এবং বাস্তব চ্যালেঞ্জ, তবুও তারা—যেমন ডুর্খেইম একটি অনুরূপ প্রসঙ্গে যুক্তি দিয়েছিলেন—মৌলিকভাবে নৈতিক প্রশ্ন, কারণ তারা শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির প্রতি আমাদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিকৃতি থেকে উদ্ভূত।" এর অর্থ, পশ্চিমা মানুষের আকিদাগত ভিত্তি গোড়াতেই ভুল, তাই তা নৈতিকতা তৈরি করতে পারে না। "এবং কারণ সেই সমস্যাগুলো সন্তোষজনকভাবে এবং genuinely সমাধান করা যায় না কেবল সেই দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করা ছাড়া।"

পশ্চিমা বিশ্বে প্রায়ই শিশুদের জিজ্ঞাসা করা হতো, "ইসলামি নৈতিকতা এবং পশ্চিমা নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য কী?" আমি সবসময় আমার সন্তানদের শিখিয়েছি যে, পার্থক্যটি হলো নৈতিকতার মানদণ্ডে। পাশ্চাত্যে, মিথ্যা বললে কেউ লজ্জিত হয় না। কারণ আমাদের মধ্যে লজ্জা একটি ইসলামি অনুভূতি থেকে আসে, যা তাদের মধ্যে নেই।

লেখক বলেছেন: "এই সমাধানগুলোর সরাসরি প্রভাব কেবল আধুনিক বিশ্বে ইসলামি শাসনের সম্ভাবনার উপরই নয়, বরং তা মূলত আধুনিক রাষ্ট্র এবং তার সার্বিক পরিস্থিতির উপরও পড়ে। বস্তুত, আধুনিক ইসলামের সবচেয়ে মৌলিক সমস্যাগুলো কেবল ইসলামি নয়, বরং সেগুলো আধুনিকতার প্রকল্পেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।"

এই পুরো বইটির সারমর্ম শুরুতেই একটি বাক্যে বলা যেত, কিন্তু সেই বাক্যটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার প্রতিটি অনুচ্ছেদের প্রয়োজন ছিল। বইটির মূল থিসিস অত্যন্ত সহজ: "'ইসলামি রাষ্ট্র'-এর ধারণাটি একটি স্ববিরোধিতা, যা আধুনিক রাষ্ট্রের যেকোনো প্রচলিত সংজ্ঞার সাথে সাংঘর্ষিক।" যদি আমরা এখানেই থেমে যেতাম, তবে মনে হতো তিনি ইসলামের মহান মূল্যবোধ এবং সমাজের মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কথা বলছেন।

সমসাময়িক ইসলামি প্রকল্পগুলোর এমন সমালোচনা আমি কমই পেয়েছি, যেমনটি তিনি বলেছেন: "আধুনিক ইসলামি চিন্তাধারায় রাষ্ট্রকে একটি নিরপেক্ষ ব্যবস্থা বলে ধরে নেওয়া হয়। সেখানে ভাবা হয় যে, নেতারা এই রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে ব্যবহার করে জনগণের ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন।" তিনি বলতে চেয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোগতভাবেই নিপীড়নমূলক এবং অনিবার্যভাবে ইসলামের অভ্যন্তরীণ বিলোপের দিকে পরিচালিত হয়।

আধুনিক রাষ্ট্র যে অর্থনৈতিক যুক্তি আরোপ করে, তা কি মানুষের উপকারের জন্য নাকি মানুষকে পিষে ফেলার জন্য? নিঃসন্দেহে, মানুষকে পিষে ফেলার জন্য। বিশ্বের ২% মানুষের হাতে অর্থনীতি, আর বাকি ৯৮% তাদের দাস।

ইসলামপন্থীরা আধুনিক রাষ্ট্রকে কীভাবে দেখে? নিরপেক্ষ হিসেবে। তাদের মতে, আপনি এটিকে নিপীড়ন, স্বৈরাচার, গণতন্ত্র বা ইসলাম—যেকোনো কিছু দিয়েই পূরণ করতে পারেন। লেখক বলেন: এটি একটি সরল ধারণা!

তিনি বলেন: "আধুনিক ইসলামি বয়ানগুলো আধুনিক রাষ্ট্রকে এভাবেই দেখে, ঠিক যেমন অ্যারিস্টটল এবং তার অনুসারীরা যুক্তিবিদ্যাকে দেখেছিল: একটি নিরপেক্ষ কৌশল বা একটি সরঞ্জাম হিসেবে।" মুসলিম যুক্তিবিদরা বলতেন, ব্যাকরণ জিহ্বাকে ভুল থেকে রক্ষা করে, আর যুক্তিবিদ্যা মনকে ভুল থেকে রক্ষা করে। তারা এটিকে একটি নিরপেক্ষ সরঞ্জাম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কে এই তত্ত্বটি ধ্বংস করে বলেছিলেন যে অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যা নিরপেক্ষ নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট আকিদাকেই সমর্থন করে? তিনি হলেন ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ। তিনি বলেছিলেন যে, এটি ছিল গ্রিকদের সোফিস্ট্রির (কুযুক্তির) সমস্যার একটি নির্দিষ্ট সমাধান। কিন্তু মুসলিমরা এটিকে একটি নিরপেক্ষ সরঞ্জাম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ইবন তাইমিয়্যাহ আমাদের জন্য এটি স্পষ্ট করেছিলেন যে, এটি তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই তৈরি একটি সৃষ্টি ছিল।

উদাহরণস্বরূপ, تصورات (ধারণা) এবং تصديقات (প্রত্যয়ন)-এর বিষয়টির কথা ভাবুন। অ্যারিস্টটলের মতে, জ্ঞান দুই প্রকারের: ধারণা এবং প্রত্যয়ন। তিনি বলেছিলেন, ধারণা সংজ্ঞায়ন (হদ্দ) ছাড়া তৈরি হয় না, এবং প্রত্যয়ন তৈরি হয় প্রতিজ্ঞা ও অনুরূপ বিষয়ের মাধ্যমে। এই কারণে, ইসলামি দর্শনে এই ধারণা জন্ম নিয়েছিল যে, কোনো জিনিস তার সংজ্ঞা ছাড়া কল্পনা করা যায় না। ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ এসে এটি খণ্ডন করে বলেন, কোনো জিনিসকে কল্পনা করার সর্বোত্তম উপায় হলো একটি উদাহরণ দেওয়া, সংজ্ঞা নয়। যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন, "ঘড়ি কী?" এবং এর জন্য একটি জটিল সংজ্ঞা তৈরি করার চেষ্টা করেন, তবে কোনটি উত্তম: সেই জটিল সংজ্ঞা, নাকি যখন কেউ আপনাকে দেখিয়ে বলে, "এটি একটি ঘড়ি"? অ্যারিস্টটল অদৃশ্যের ধারণাকে সংজ্ঞা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে বুঝতে পারেননি, কিন্তু ইবন তাইমিয়্যাহ তা খণ্ডন করেছেন।

লেখক বলেন, "একসময় অ্যারিস্টটল এবং তাঁর অনুসারীরা যুক্তিবিদ্যাকে একটি নিরপেক্ষ কৌশল হিসেবে বিবেচনা করতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি ততক্ষণ পর্যন্ত অটুট ছিল, যতক্ষণ না মুসলিম চিন্তাবিদরা উপলব্ধি করেন যে, এর আনুষ্ঠানিক কাঠামোটি কিছু নির্দিষ্ট অধিবিদ্যামূলক বা তত্ত্বগত ধারণার উপর নির্ভরশীল। এই অন্তর্নিহিত ধারণাগুলোই যুক্তির প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে, এই যুক্তিবিদ্যা গ্রহণ করার অর্থ ছিল এমন একটি দর্শনকে পরোক্ষভাবে মেনে নেওয়া, যা অধিকাংশ মুসলিম পণ্ডিতের কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিল।"

এটুকুই যথেষ্ট। আমি আপনাদের একটি উদাহরণ দিতে চেয়েছিলাম যে, তিনি কীভাবে তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তিনি আরও অনেক কিছু উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আলোচনা দীর্ঘায়িত না করার জন্য সংক্ষেপে বললাম।

তিনি বিশ্বায়নের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং কয়েকটি বাক্যে এর সারসংক্ষেপ করেছেন: "সংকটের উপর সমাপনী মন্তব্য"—অর্থাৎ আধুনিকতার সংকট। তিনি বলেন, "যেহেতু আমরা একটি ইসলামি শাসনের প্রতিষ্ঠার কথা বলছি, আমাদের অবশ্যই এটাও ধরে নিতে হবে যে, এই ধরনের শাসন আজকের এবং আগামীকালের বিশ্বের চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হবে।" বিশ্বায়ন কি একটি অনিবার্য বাস্তবতা নাকি আরোপিত? এটি আরোপিত। বিশ্ব স্বেচ্ছায় এটি বেছে নেয়নি; বরং বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো এটি আরোপ করেছে। তারাই টেলিভিশন তৈরি করে সংস্কৃতিকে একীভূত করেছে, মূল্যবোধ ধ্বংস করতে চেয়েছে এবং তাদের পণ্যগুলো এমনভাবে বাজারজাত করেছে, যা প্রতিটি জাতির নির্দিষ্ট মূল্যবোধ ধ্বংস না করে প্রবেশ করতে পারত না।

যখন কোনো পশ্চিমা কর্পোরেশন একটি পণ্য বাজারজাত করতে চায় এবং সেই পণ্যটি আপনার মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তখন পণ্যটি প্রবেশের জন্য তাকে আপনার মূল্যবোধ ধ্বংস করতে হবে। তাহলে বিশ্বায়ন কে তৈরি করেছে? বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো।

লেখক তিনটি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছেন যা একটি ইসলামি শাসনের প্রতিষ্ঠাকে বাধাগ্রস্থ করে। তিনি বলেন, "প্রথমত, শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর সামরিক প্রকৃতি।" কেউই এর থেকে বের হতে পারে না, আর যদি কেউ বের হতে চায়, তবে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে।

"দ্বিতীয়ত, বাহ্যিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন।" আজ সীমান্ত বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। স্যাটেলাইট ডিশের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সীমান্ত ভেঙে পড়েছে। "এবং তৃতীয়ত, বিশাল উদারনৈতিক পুঁজিবাদী বিশ্ববাজার।" এখানেও সীমান্ত বন্ধ করার সুযোগ নেই। এই তিনটি বিষয়কে থামানো যাবে না। এটাই বিশ্বায়ন, যেখানে কোনো সীমান্ত নেই।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জিহাদ এবং রাষ্ট্র নির্মাণের উভয়সংকট। আমরা জানি, শাসক ও রাষ্ট্রের বৈধতার অন্যতম স্তম্ভ হলো জিহাদ। আলেমরা শর্তারোপ করেছেন যে, যদি কোনো

শাসক জিহাদ না করে, তবে তাকে পদচ্যুত করা যেতে পারে। কল্পনা করুন, এই বিশ্বায়নের মাঝে একটি ইসলামি রাষ্ট্রে জিহাদের রূপ কী হবে? লেখক ৪৬ পৃষ্ঠায় এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন: "এই প্যারাডাইম...সর্বদা সেই নৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সচেষ্ট থেকেছে, কখনও ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রায়ই সফল হয়েছে। ঠিক এটিই এটিকে একটি প্যারাডাইম্যাটিক সিস্টেমে পরিণত করেছে।" 'প্যারাডাইম্যাটিক' শব্দটি একটি সুন্দর ও প্রশংসাসূচক শব্দ, তবে 'বাস্তববাদী মডেল' বললে অর্থ আরও পরিষ্কার হয়। বাস্তব জগতে একটি মডেল হিসেবে ইসলামি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ইসলামকে প্রায়োগিক ও বাস্তবসম্মত করে তোলে।

এই অনুচ্ছেদটি পড়ার সময় আমার আবু উবাইদের 'কিতাব আল-আমওয়াল' গ্রন্থটির কথা মনে পড়ে গেল। ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের উৎসগুলো কী কী? এর প্রায় তিন-চতুর্থাংশই জিহাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এমনকি ভূমি করের (খারাজ) মতো বিষয়গুলো, যা সরাসরি জিহাদ নয়, সেগুলোও জিহাদেরই ফল। পবিত্র কুরআনে যখন এই আয়াত এলো: {হে ঈমানদারগণ, মুশরিকরা তো অপবিত্র, সুতরাং তারা যেন এ বছরের পর মসজিদুল হারামের কাছে না আসে} (আত-তাওবাহ: ২৮), তখন আল্লাহ তাদের জন্য বাণিজ্যের একটি দরজা বন্ধ করে দিলেন। এরপর তিনি কীভাবে অন্য দরজা খুললেন? এর সমাধান হিসেবে তিনি বলেন: {আর তোমরা যদি দারিদ্র্যের আশঙ্কা কর, তবে আল্লাহ চাইলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন} (আত-তাওবাহ: ২৮)। এরপরই তিনি বললেন: {যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না... তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা নত হয়ে জিযিয়া দেয়} (আত-তাওবাহ: ২৯)। এভাবেই তিনি আরেকটি দরজা খুলে দিলেন।

লেখক বলেন, "এই ব্যবস্থাটি তার স্বর্ণযুগে জিহাদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, যদিও আজ এই ধারণাটির একটি খারাপ খ্যাতি রয়েছে...।"

বইটি পড়তে গিয়ে আমার ইসলামি ব্যাংকগুলোর কথা মনে পড়লো। লেখক যেমন (ইসলামি) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলেছেন, ঠিক তেমনিভাবে আমার মনে হয়, এই সুদভিত্তিক পৃথিবীতে বর্তমান রূপে ইসলামি ব্যাংকগুলোর পক্ষে সত্যিকারের ইসলামি ব্যাংকে পরিণত হওয়াও অসম্ভব।

আমি চাই, আমাদের ভাইয়েরা বইটি পড়ুন। এই বই আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়, আর তা হলো—অন্যের চোখে কোনো বই না দেখে, আমাদের নিজেদেরই তা পড়া উচিত। আমি আবারও এই কথাটির ওপর জোর দিচ্ছি। বইটি আমাদের কাছে এটিও স্পষ্ট করে যে, সংস্কারবাদের মাধ্যমে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এটি একটি ফাঁকা বুলি ও কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কেন্দ্রে আঘাত হেনে তাকে দুর্বল করা না যাবে, ততক্ষণ একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

একটু ভেবে দেখুন, আমেরিকার কেন্দ্রিকতার পতন ছাড়া ইসরায়েল রাষ্ট্রের পতন কি আদৌ সম্ভব? আমরা জানি, একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ফিরে আসবে না। কিন্তু যদি কোনো সহজ পথের কথাও ভাবি, তাহলেও কি এই জাহেলিয়াতের কেন্দ্রবিন্দুর পতন ছাড়া ইসরায়েলের বিলুপ্তি কল্পনা করা যায়?

উত্তরটি এখানেই নিহিত। এজন্যই আমরা আল্লাহর কাছে মুজাহিদদের বিজয় ও সাহায্যের জন্য দোয়া করি। আমরা নিশ্চিত যে, ঐশী বিধান অনুযায়ী কেন্দ্রের আধিপত্য বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর তাগুতদের অপসারণ করা এবং ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। লেখক বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বইয়ের শুরুর দিকে, প্রায় ৪০-৪৫ পৃষ্ঠার মধ্যে, তিনি অত্যন্ত জোরালোভাবে বলেছেন যে, কেন্দ্র নিজে পতিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো শাখার পক্ষে স্বাধীনভাবে মুক্তি লাভ করা অসম্ভব।

আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। সাফল্য কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন এবং আপনাদের ওপর বরকত নাজিল করুন। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।